ইউনিট-১৮

গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন ও রোগ

ভূমিকা

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গবাদি পশুর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাংস ও দুধ উৎপাদন ছাড়াও হাল চাষ, গ্রামীণ পরিবহন, ফসল মাড়াই ইত্যাদি কাজের জন্য গবাদি পশু পালন করা হয়ে থাকে। গবাদি পশুর চামড়া রপ্তানি করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। গবাদি পশুর খামার স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের দেশী জাতের গরু খুব একটা উন্নত নয়। এদের উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। তাই লাভজনক ভাবে গবাদি পশু পালনের জন্য এদের উন্নয়ন প্রয়োজন। এ ইউনিটে দেশী গবাদি পশুর পরিচিতি, গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, গর্ভবতী গাভী ও ষাঁড়ের যত্ন, গবাদি পশুর রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, টীকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১৮.১ : দেশী গবাদি পশুর পরিচিতি

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দেশী গবাদি পশুর পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের গরুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ গরুই দেশী। এদেরকে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন জাত বা উন্নত জাতের বলা যাবে না। এরা জেবু অর্থাৎ (Bos indicus) (বস ইন্ডিকাস) প্রজাতিভুক্ত। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে ঘরে ঘরে গরু পালিত হয়ে আসছে। উৎপাদন ক্ষমতা কম হলেও এরা এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে খাপ খেয়ে টিকে আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সমস্ত গরু আছে তাদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) দেশী জাতের গরু।

(খ) উন্নত বিদেশী জাতের গরু।

(গ) উন্নত সংকর জাতের গরু।

(ক) দেশী জাতের গরু : আমাদের দেশে অধিকাংশ গরুই দেশী জাতের। এরা আকারে ছোট। একটি প্রাপ্তবয়স্ক গরুর ওজন ১৫০-২৫০ কেজি মাত্র। দেশী জাতের গরুর কুঁজ উঁচু হয় এবং এদের গায়ের রং বিভিন্ন ধরনের। যেমন– সাদা, কাল, লালো, ধূসর ইত্যাদি। এদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। একটি গাভী দৈনিক ১.৩ লিটার মাত্র দুধ দিয়ে থাকে। এদের কাজ করার ক্ষমতাও কম। দেশী জাতের গরুকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– (১) লাল হাঁটগেয়ে গরু, (২) মাঝারি আকারের গরু এবং (৩) ছোট আকারের সাধারণ গরু।

(১) লাল চাঁটগায়ে গরু :- চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ জাতের গরুর উৎপত্তিস্থল। এরা দেখতে বেশ সুন্দর। এদের গায়ের রং হালকা লাল। গলকম্বল ছোট, ঘাড় চিকন। এদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২-৩ লিটার।

(২) মাঝারি আকারের গরু : পাবনা, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে এ ধরনের **গরু** পাওয়া যায়। আকারে এরা অন্যান্য অঞ্চলের **গরু**র চেয়ে আকারে বড় এবং এদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতাও কিছুটা বেশি। ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকার কোন কোন অঞ্চলেও এ ধরনের **গরু** পাওয়া যায়।

(৩) দেশী ছোট গরু : বাংলাদেশের সর্বত্র এ ধরনের **গরু** দেখা যায়। এরা আকারে খুব ছোট এবং এদের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক এক লিটার বা তারও কম। দেশী জাতের **গরু** প্রথম বাচ্চা দেয় সাড়ে তিন থেকে চার বৎসর বয়সে।

দেশী **গরু** ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নত জাতের বিদেশী ফ্রিজিয়ান ও শাহীওয়াল জাতের **গরু** পাওয়া যায়। এরা মূলত দুধ উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। তবে আকারে বড় হওয়ায় এদের থেকে অনেক বেশি মাংসও পাওয়া যায়। এ জাতের গাভী ৫০০-৬০০ কেজি ওজনের হয়। এরা দৈনিক ৩০ লিটার পর্যন্ড় দুধ দেয়। বিদেশী উন্নত জাতের **গরু**র সাথে দেশী গাভীর প্রজনন করে উন্নত সংকর জাতের **গরু** সৃষ্টি করা যায়। উন্নত ফ্রিজিয়ান ও শাহীওয়াল জাতের **গরু**র সাথে দেশী **গরু**র প্রজনন করে বাংলাদেশে সংকর জাতের **গরু** সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ২০ লক্ষ উন্নত সংকর জাতের **গরু** আছে। এদের মাংস ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা দেশী **গরু**র চেয়ে অনেক বেশি। এরা আমাদের আবহাওয়ার সাথে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিতে পারে। উন্নত জাতের এবং সংকর জাতের **গরু** সাধারণত ৩ বছরের কম বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। সংকর জাতের **গরু** থেকে দৈনিক গড়ে ১০ থেকে ১৫ লিটারের বেশি দুধ পাওয়া যায়।

মহিষ : আমাদের দেশে উপকূলীয় অঞ্চল, চরের নিম্নাঞ্চলে হাল চাষ এবং গাড়ি টানার জন্য মহিষ পালন করা হয়ে থাকে। এদের থেকে দুধও পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মহিষের কোন উল্লেখযোগ্য জাত নেই। ভারত ও পাকিস্তানের মুরা, সুরতি এবং নিলি-রাভী মহিষের দুধের জন্য প্রসিদ্ধ। এরা সর্বোচ্চ ১৫-২০ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে।

ভেড়া : চরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভোড়া পালন করা হয়। আমাদের দেশী ভেড়া খুব একটা উন্নত মানের নয় শুধুমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্য এদের পালন করা হয়।

সারমর্ম

দেশী জাতের গরু আকারে ছোট। এদের মাংস ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। তবে এরা আমাদের আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে। দেশী গরুকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) চট্রগ্রামের লাল গরু (২) মাঝারি আকারের গরু এবং (৩) ছোট আকারের সাধারণ গরু। বিদেশী উন্নত জাত ও সংকর জাতের গরু থেকে অধিক পরিমাণে দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ সংকর জাতের গরু আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আমাদের দেশী গরু কোন প্রজাতিভূক্ত ?

(ক) Bos indicus (খ) Bos taurus

(গ) কোনটাই নয় (ঘ) Bos frontalis

২। প্রাপ্তবয়স্ক দেশী গরু ওজনে কত হয়?

(ক) ১৫০-২৫০ কেজি (খ) ২০০০ কেজি

(গ) ২৫০ কেজি (ঘ) ৩০০ কেজি।

৩। দেশী গাভী দৈনিক কত লিটার দুধ দিয়ে থাকে?

(ক) ১.৩ লিটার (খ) ৪ লিটার

(গ) ৫ লিটার (ঘ) ৮ লিটার

৪। ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী দৈনিক কত লিটার দুধ দেয়?

(ক) ১০ লিটার (খ) ২০ লিটার

(গ) ৩০ লিটার (ঘ) ৪০ লিটার

৫। সংকর জাতের গাভী দৈনিক গড়ে কত লিটার দুধ দেয়?

(ক) ১-৩ লিটার (খ) ৪ লিটার

(গ) ৫-৮ লিটার (ঘ) ১০-১৫ লিটার

পাঠ-১৮.২ : গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে কী কী সুফল পাওয়া যায় সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাত উন্নয়নের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের গবাদি পশুর শতকরা ৯৫ ভাগই দেশী অনুন্নত জাতের। এদের কর্মশক্তি এবং উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ফসল উৎপাদন এবং দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য গবাদি পশুর প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বেড়ে গেছে। তা ছাড়াও দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ তাদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক আয়ের জন্য গবাদি পশুর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। দেশী গবাদি পশু উন্নয়নের মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য :

১। দুধ উৎপাদন বাড়ানো : একটি দেশী গাভী থেকে যেখানে দৈনিক ১.৩ লিটার দুধ পাওয়া যায় সেখনে জাত উন্নয়ন করে একটি সংকর উন্নত জাতের গাভী হতে দৈনিক ১০-১৫ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া সম্ভব।

২। মাংস ও চামড়া উৎপাদন বাড়ানো : দেশী গরুর ওজন গড়ে ১৫০-২৫০ কেজি অথচ সংকর জাতের ৩০০-৪০০ কেজি ওজনের হয়ে থাকে। তাই জাত উন্নয়ন করে এদের থেকে অনেক বেশি মাংস পাওয়া যাবে। এদের চামড়াও আকারে বড় হবে এবং গুণগত মানও ভালো হবে।

৩। কাজের ক্ষমতা বাড়ানো : দেশের ৯৫% কৃষি জমি এখনও গবাদি পশুর দ্বারা চাষ করা হয়। দেশী এক জোড়া বদল দ্বারা বছরে ৩-৪ একর জমি চাষ করা সম্ভব। অপর পক্ষে এক জোড়া সংকর জাতের বলদ দ্বারা বছরে ৭-৮ একর জমি চাষ করা সম্ভব।

৪। অধিক কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধি : উন্নত সংকর জাতের গাভী পালন করে এবং গরু মোটা তাজা করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা কমবে। আয় বেড়ে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে।

৫। খামার স্থাপন : বড় আকারের খামার স্থাপন করে অধিক পরিমাণে দুধ ও মাংস উৎপাদন করা যাবে। ফলে গুঁড়া দুধ আমদানি বন্ধ হয়ে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ দ্বারা প্রজননের মাধ্যমে গরুর জাতের উন্নয়ন ঘটানো যায়। দেশী বকনা ও গাভীকে উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ দ্বারা প্রজনন করালে উন্নত সংকর জাতের গরু পাওয়া যায়।

সাধারণত দুই পদ্ধতিতে বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানো হয়। যেমন–

১। প্রাকৃতিক প্রজনন বা স্বাভাবিক প্রজনন

২। কৃত্রিম প্রজনন।

প্রাকৃতিক প্রজনন : ষাঁড় দ্বারা সরাসরি বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানোকে প্রাকৃতিক প্রজনন বা স্বাভাবিক প্রজনন বলে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত অনুন্নত জাতের ষাঁড় দিয়ে বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানো হয়ে থাকে। তবে সরকারিভাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিছু উন্নত জাতের

ষাঁড় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ ষাঁড় দিয়ে প্রজনন করিয়ে উন্নত জাতের বাচ্চা পাওয়া যায়।

কৃত্রিম প্রজনন : কৃত্রিম উপায়ে ষাঁড় থেকে বীজ সংগ্রহ করে গরম হওয়া গাভীকে প্রজনন করানোকে কৃত্রিম প্রজনন বলে। কৃত্রিম উপায়ে ষাঁড় থেকে বীর্য বা সিমেন সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর নির্দিষ্ট মাত্রায় সেই সীমেন দিয়ে গরম হওয়া বা ডাকে আসা বকনা বা গাভীকে প্রজনন করিয়ে গর্ভবতী করা হয়। এ পদ্ধতিতে বকনা বা গাভী হতে যে বাচ্চা পাওয়া যায় তার মধ্যে উন্নতজাতের গুণাগুণ প্রথম বংশের শতকরা ৫০ ভাগ থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে এ ৫০ ভাগ উন্নত জাতে সম্পন্ন বকনাকে উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে পুনরায় কৃত্রিম প্রজনন করালে যে বাচ্চা পাওয়া যাবে তার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ উন্নত জাতের গুণাগুণ পাওয়া যাবে। এভাবে বংশানুক্রমে প্রজনন করিয়ে দেশী জাতের গবাদি পশুকে উন্নত জাতে রূপান্তর করা যায়।

বকনা বা গাভী ডাকে আসা বা গরম হওয়ার সময়কে ঋতুকাল বলে। বকনা বা গাভীর ঋতুকাল ১৬-৩০ ঘণ্টা (গড়ে ২৪ ঘণ্টা) হয়ে থাকে। ঋতুকালের ১২-১৮ ঘণ্টার মধ্যে বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানোর উৎকৃষ্ট সময়। গাভীর গরম হওয়া বা ঋতুকালে সময়মত বা সঠিকভাবে প্রজনন না করালে বকনা বা গাভী গর্ভবতী হয় না। তাই গাভীর গরম হওয়া বা ঋতুকালের লক্ষণগুলো জানা প্রয়োজন।

গাভীর ঋতুকালের লক্ষণগুলো হলো :

- গাভীর অস্থিরতা বাড়বে, ঘন ঘন ডাকবে।
- ঘন ঘন প্রস্রাব করবে, দুধ কমে যাবে।
- গাভীর খাওয়া কমে যায়।
- গাভীর যোনীমুখ ফুলে যায় এবং লাল দেখায়। যোনীমুখ থেকে পরিষ্কার স্বচ্ছ আঠালো শ্লেষা বের হয় এবং লেজের গোড়ায় ও পেছনে তা লেগে থাকে।
- পশু অন্য পশুর উপর উঠতে চায় এবং অন্য পশুকে নিজের উপর উঠতে দেয়।

একটি দেশী বকনা দুই থেকে আড়াই বছর বয়সে প্রথম প্রজননের উপযুক্ত হয়। সংকর জাতের বকনা দেড় থেকে দুই বৎস বয়সে প্রজননের জন্য প্রথম উপযুক্ত হয়। প্রজননের ২৮০ দিন (কম বেশি ১০ দিন) পর গাভী বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা দেওয়ার ৬০ দিন পর পুনরায় ডাকলে গাভীকে প্রজনন করতে হয়। তবে ৯০ দিন পার হওয়ার পরও গাভী না ডাকলে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির সুবিধা :

(১) এ পদ্ধতিতে উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে অতি অল্প সময়ে দেশী গরুর জাত উন্নয়ন করা যায়।

(২) একটি ষাঁড় দ্বারা একটি বকনা বা গাভীকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে একবার প্রজনন করানো যায়। কিন্তু একটি ষাঁড়ের একবার সংগৃহীত বীজ দ্বারা ২০০ পর্যন্ত বকনা বা গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করানো যায়।

(৩) কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে ষাঁড় হতে বকনা বা গাভীতে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা অত্যন্ত কম থাকে।

(৪) সকলের পক্ষে ভালো জাতের ষাঁড় রাখা সম্ভব হয় না। উন্নত জাতের ষাঁড় পালন ব্যয়বহুল এবং শ্রমসাধ্য। তাই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির জন্য ঘরে ঘরে ষাঁড় পালনের প্রয়োজন হয় না।

কৃত্রিম প্রজনন সফল না হওয়ার কারণ–

কৃত্রিম প্রজনন অনেক সময় সফল হয় না। এর প্রধান কারণগুলো হলো

(১) ঋতুকালের নির্দিষ্ট সময়ে গাভীকে প্রজনন না করানো।

(২) ঠিকমত প্রজনন না করালে অর্থাৎ প্রজনন কাজে ত্রুটি থাকলে।

(৩) প্রজননের জন্য ব্যবহৃত বীজ বা শুক্রাণু মৃত হলে।

(৪) অনিয়মিত গরম হওয়া বকনা বা গাভীকে প্রজনন করালে।

(৫) নোংরা পরিবেশ, অপরিচ্ছন্ন যন্ত্রপাতি জীবাণু মুক্ত না করে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন করালে।

(৬) যে কোন প্রকারের যৌন রোগাক্রান্ত বকনা বা গাভীকে প্রজনন করালে।

(৭) পরিশ্রান্ত বকনা বা গাভীকে কাজ করানোর পরপরই বা অনেক দূর হতে হাটিয়ে কৃত্রিম প্রজনের জন্য আনা হয় এবং পশুকে বিশ্রাম না দিয়ে সাথে সাথে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। তারপর আবার বিশ্রাম না দিয়ে কাজে লাগানো হয় বা হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এতে গাভী গর্ভবতী নাও হতে পারে।

সারমর্ম

- গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো দুধ ও মাংস উৎপাদন এবং পশুর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- দেশী বকনা বা গাভীকে উন্নত জাতের ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করালে উন্নত সংকর জাতের গরু পাওয়া যায়। ষাঁড় দ্বারা সরাসরি প্রজননকে স্বাভাবিক প্রজনন বলে।
- উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে গাভী বা বকনাকে প্রজনন করানোকে কৃত্রিম প্রজনন বলে।
- বকনা বা গাভী ডাকার ১২-১৮ ঘণ্টার মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন করাতে হয়।
- প্রজনন করানোর ২৮০ দিন (১০ দিন আগে বা পরে) পর গাভী বাচ্চা প্রসব করবে।
- বাচ্চা প্রসবের ৬০ দিন পর পুনরায় গরম হলে গাভীকে পুনরায় প্রজনন করাতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একটি সংকর জাতের গাভী হতে দৈনিক কত লিটার দুধ পাওয়া যায়?

(ক) ১-৩ লিটার (খ) ৩-৫ লিটার

(গ) ৫-৮ লিটার (ঘ) ১০-১৫ লিটার

২। দেশী একজোড়া বলদ দ্বারা বছরে কত একর জমি চাষ করা যায়?

(ক) ৩-৪ একর (খ) ৪-৫ একর

(গ) ৫-৬ একর (ঘ) ৬-৭ একর

৩। উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ দ্বারা প্রজনন করালে যে বাচ্চা পাওয়া যাবে তাতে উন্নত জাতের ষাঁড়ের গুণাগুণ প্রথম বংশ কত ভাগ পাওয়া যাবে?

(ক) ২৫ ভাগ (খ) ৫০ ভাগ

(গ) ৭৫ ভাগ (ঘ) ১০০ ভাগ

৪। ঋতুকালের মধ্যে কোন সময় বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানোর জন্য উৎকৃষ্ট?

(ক) ১০-১২ ঘণ্টা (খ) ১২-১৮ ঘণ্টা
(গ) ১৫-২০ ঘণ্টা (ঘ) ১৮-৩০ ঘণ্টা

৫। একটি উন্নত সংকর জাতের বকনা প্রথম কত বয়সে প্রজননের উপযুক্ত হয়?
(ক) ১.৫-২ বছর (খ) ২.৫ বছর
(গ) ৩ বছর (ঘ) ৪ বছর

৬। প্রজনন করানোর কত দিন পর পশু বাচ্চা প্রসব করে?
(ক) ২৫০ দিন (খ) ২৬০ দিন
(গ) ২৭০ দিন (ঘ) ২৮০ দিন

৭। বাচ্চা প্রসব করার কতদিন পর গাভীকে পুনরায় প্রজনন করাতে হয়?
(ক) ৪০ দিন (খ) ৬০ দিন
(গ) ৮০ দিন (ঘ) ১০০ দিন

৮। কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে একটি ষাঁড়ের একবার সংগৃহীত বীজ দ্বারা কতটি বকনা বা গাভীকে প্রজনন করানো যায়?
(ক) ১ টি (খ) ৫০টি
(গ) ১০০ টি (ঘ) ২০০ টি

পাঠ-১৮.৩ : গর্ভবতী গাভীর লক্ষণ, যত্ন ও পরিচর্যা এবং প্রজননক্ষম ষাঁড়ের যত্ন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গর্ভবতী গাভীর লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গর্ভবতী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রজননক্ষম ষাঁড়ের যত্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

গর্ভ ধারনের পর গাভীর দৈহিক ও প্রকৃতিগত অনেক পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন অবশ্য সকল পশুতে সমভাবে দেখা যায় না। তবে গর্ভ ধরনের ৩ মাস পর লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। গর্ভ ধারনের লক্ষণ দুই ভাবে প্রকাশ পায় (১) বাহ্যিক (২) আভ্যন্তরীণ।

গর্ভবতী গাভীর প্রধান বাহ্যিক পরিবর্তনগুলো হলো-

বাহ্যিক :

১। গর্ভবতী হলে বকনা বা গাভীর ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাবে, পশু ডাকে আসবে না।

২। গাভীর দুধ উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে থাকবে।

৩। পশুর পেট ক্রমশ বড় হতে থাকবে।

৪। গর্ভকালের শেষ দিকে ওলান আস্তে আস্তে বড় হবে।

আভ্যন্তরীণ লক্ষণ

১। বাচ্চার বৃদ্ধির সাথে সাথে জরায়ু বেড়ে সম্মুখে ও নিচের দিকে প্রসাবিত হয়।

২। জরায়ু মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

৩। গর্ভ পরীক্ষায় বাচ্চার অবস্থান বুঝা যায়।

গর্ভবতী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

গাভী গর্ভবতী হওয়ার পর এদের বিশেষ যত্ন নিতে হয়। গর্ভধারণের পর প্রথম সাত মাস পর্যন্ত পশুর পরিচর্যা, খাদ্য প্রদান, দুধ দোহন স্বাভাবিকভাবেই করতে হয়। সাত মাস পর আস্তে আস্তে দুধ দোহন বন্ধ করতে হবে। তবে বাচ্চা প্রসবের ৪০ দিন পূর্বে দুধ দোহন একবারে বন্ধ করে দিতে হবে। যদি দুধ উৎপাদন বন্ধ না হয় তাহলে গাভীকে দানাদার খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ছোবড়া জাতীয় খাবার বেশি দিতে হবে। আট মাস থেকে বাচ্চা পর্যন্ত গর্ভবতী গাভী এবং বাচ্চার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য সুষম খাদ্য দিতে হবে। গাভীর গর্ভধারণকাল গড়ে ২৮০ দিন।

গর্ভবতী গাভীর দৈনিক সুষম খাদ্যের তালিকা

১। কাঁচা ঘাস দৈনিক ১২-১৫ কেজি।

২। শুকনা খড় দৈনিক ৩-৪ কেজি।

দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তালিকা

উপকরণ	**পরিমাণ**
ক. গমের ভুষি	৫.৬০ কেজি
খ. চাউলের কুঁড়া	১.৫০ কেজি
গ. সরিষা, তিল বা বাদামের খৈল	১.২৫ কেজি
ঘ. খেসারী বা কলাই ভাঁঙ্গা	১.২৫ কেজি
ঙ. খনিজ মিশ্রণ	০.৩০ কেজি
চ. লবণ	০.১০ কেজি
মোট	**১০ কেজি**

উপকরণগুলো ভালো করে একসাথে মিশিয়ে প্রতি গাভীকে ১-৩ কেজি খাওয়াতে হবে।

গাভীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিষ্কার পানি দিতে হবে। বাচ্চা দেওয়ার প্রায় দুই সপ্তাহ আগে থেকে শুকনা খড় জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ আস্ড়ে আস্ড়ে কমিয়ে কাঁচা ঘাস এবং খুঁদের জাউ জাতীয় নরম খাদ্য খেতে দিতে হবে। গর্ভবতী গাভীকে আলাদা করে রাখতে হবে। এ অবস্থায় গাভীকে দিয়ে কোন কাজই করানো যাবে না। এমনকি গাভীকে দীর্ঘপথ হাঁটানো, দৌড়ানো বা অন্য পশুর সাথে সরাসরি চরতে দেয়া বা ভয় দেখানো যাবে না। বাসস্থান পরিষ্কার শুকনা রাখতে হবে যাতে ঘর পিচ্ছিল না হয়। ঘরে ধানের খড় দিয়ে বা ছালা বিছিয়ে বিছানা করে দেয়া যেতে পারে।

গাভীকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে এবং মশা-মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রসবের ৩-৪ দিন পূর্বে রাতেও খেয়াল রাখতে হবে।

গাভী গর্ভবতী হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। বাচ্চা প্রসবের পূর্বে নিম্নেবর্ণিত লক্ষণ দেখা যায় :

- খাবারের পরিমাণ কমে যাবে।
- ঘন ঘন প্রসাব হবে।
- ওলান কাঁচলা বা শাল দুধে পূর্ণ হয়ে যাবে।
- অস্থিরতা অনুভব করবে। প্রসব ব্যথা উঠবে এবং শুয়ে পড়বে।

প্রসবের পথ স্ফীত ও লাল হবে এবং সেখান থেকে শ্লেষ্মা বের হবে।

বাচ্চা প্রসবের পর পরই গাভীর ফুল বের হয়ে যাবে। ফুল সাথে সাথে দূরে নিয়ে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। কেননা গাভী ফুল খেয়ে ফেলতে পারে। এতে অজীর্ণতা দেখা দিতে পারে এবং দুধ উৎপাদন কমে যেতে পারে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি ফুল না পড়ে তা হলে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে। ফুল ভিতরে থাকলে পঁচে গিয়ে রোগ জীবাণুর আক্রমণে জরায়ুতে পচন সৃষ্টি হতে পারে। সময়মত চিকিৎসা না করালে গাভী মারাও যেতে পারে। গাভীর বাসস্থান পরিষ্কার শুকনা রাখতে হবে। গাভীর খাবারের প্রতিও নজর দিতে হবে। প্রসবের পর কুসুম গরম পানি দিয়ে গাভীকে ধুয়ে দিতে হবে। গাভীর ওলান ও বাট কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। দুধের বাটে বাছুরের মুখ লাগিয়ে শাল দুধ খেতে দিতে হবে। অনেকে দোহন করে শাল দুধ ফেলে দেয়। এমনটি করা উচিত নয়। শাল দুধ খেলে বাছুরের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। প্রথম ৩-৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাছুরের বিশেষভাবে যত্ন নিতে হয়। এ সময় বাছুরকে পরিমাণ মত দুধ খাওয়ানো দরকার। বাছুরের বয়স ২ সপ্তাহ হলে দুধের সাথে কঁচি ঘাস, চিকন খড় এবং দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হয়।

বাছুরের দানাদার খাদ্য তালিকা

উপকরণ	পরিমান
গমের ভুষি	৪ কেজি
ভাঙ্গা ছোলা	১ কেজি
ভাঙ্গা খেসারি	২ কেজি
তিলের খৈল	২ কেজি
ভূট্টা ভাঙ্গা	৭০০ গ্রাম
খনিজ ভিটামিন মিশ্রণ	২০০ গ্রাম
লবণ	১০০ গ্রাম
মোট	**১০ কেজি**

প্রাথমিক অবস্থায় উপরোক্ত দানাদার খাদ্য মিশ্রণ দৈনিক ৫০ গ্রাম করে দিতে হবে এবং ৩ মাস পর দৈনিক ৫০০ গ্রাম সরবরাহ করতে হবে।

বাচ্চা প্রসবের পর গাভীতে দুধজ্বর ও ওলান প্রদাহ এ দুটি রোগ দেখা দিতে পারে। দুধজ্বর অপুষ্টিজনিত রোগ। দুধের সাথে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম বের হওয়ার ফলে এ রোগ হয়। গাভীর ওলান থেকে ঠিকমতো দুধ বের করে না আনলে এবং দুধ দোহনে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা না নিলে গাভীর ওলান প্রদাহ রোগ হতে পারে।

ডাক্তারের পরামর্শ মত উপযুক্ত সময়ে উভয় রোগেরই চিকিৎসা করাতে হয়।

প্রজননক্ষম ষাঁড়ের যত্ন

প্রজননের জন্য ষাঁড়ের বাচ্চা অবস্থা থেকে সঠিকভাবে যত্ন নিতে হয়। ষাঁড়ের শারীরিক সুস্থতা বীজের বা সিমেনের গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই, বাছাইয়ের পর সাধারণত প্রজনন ষাঁড় নির্বাচন করা হয়। প্রজনন ষাঁড়ের যত্নের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো :

১। প্রত্যেকটি ষাঁড়কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলাদা ঘরে রাখতে হবে।

২। পরিমাণ মত সুষম খাদ্য দিতে হবে।

৩। উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সরবরাহ করতে হবে।

৪। প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দৈনিক ১.৫-২ কেজি সুষম দানাদার খাদ্য ও ৩-৪ কেজি কাঁচা ঘাস দিতে হবে।

৫। সপ্তাহে ২ বারের বেশি বীজ বা সিমেন সংগ্রহ করা যাবে না।

৬। নিয়মিত প্রতিষেধক টীকা দিতে হবে।

৭। কোন রোগ দেখা দিলে সংগে সংগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

সারমর্ম

- বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য এবং অনুভব করে, গাভী গর্ভবতী হয়েছে কিনা বুঝা যায়।
- বাচ্চা প্রসবের ৪০ দিন পূর্বে গাভীর দুধ দোহন বন্ধ করে দিতে হয়।
- গর্ভবতী গাভীকে সুষম খাদ্য দিতে হয়।
- গর্ভবতী গাভী দ্বারা কোন ভারী কাজ করানো উচিত নয়।
- পশুর ঘর পরিষ্কার এবং শুকনা রাখতে হবে। প্রসবের পূর্বে ঘরে শুকনা খড় বা ছালা দিয়ে বিছানা করে দেয়া উত্তম।
- লক্ষণ দেখে বাচ্চা প্রসবের সময় বুঝা যায়।
- জন্মের পর বাছুরকে শাল দুধ খাওয়াতে হয়।
- প্রজনন ষাঁড়ের যথাযথভাবে যত্ন নিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। গর্ভবতী হওয়ার কয় মাস পর আস্তে আস্তে গাভীর দুধ দোহন বন্ধ করতে হবে?
(ক) তিন মাস (খ) পাঁচ মাস
(গ) সাত মাস (ঘ) নয় মাস

২। গর্ভবতী গাভীকে দৈনিক কত কেজি শুকনা খড় খাওয়াতে হয়?
(ক) ১-২ কেজি (খ) ১-৩ কেজি
(গ) ৩-৪ কেজি (ঘ) ১-৫ কেজি

৩। গর্ভবতী গাভীর জন্য ১০ কেজি দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কতটুকু চাউলের কুঁড়া দিতে হয়?
(ক) ১.০০ কেজি (খ) ১.২৫ কেজি
(গ) ১.৫০ কেজি (ঘ) ১.৭৫ কেজি

৪। গর্ভবতী একটি গাভীকে দৈনিক কতটুকু দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হয়?

(ক) ১-২ কেজি (খ) ১-৩ কেজি
(গ) ১-৪ কেজি (ঘ) ১-৫ কেজি

৫। কত বয়সে বাছুরকে দুধের সাথে ঘাস ও দানাদার খাদ্য দিতে হয়?
(ক) ১ সপ্তাহ (খ) ২ সপ্তাহ
(গ) ৩ সপ্তাহ (ঘ) ১ মাস

৬। বাছুরকে প্রাথমিক অবস্থায় দৈনিক কী পরিমাণ দানাদার খাদ্য দিতে হয়?
(ক) ২০ গ্রাম (খ) ৪০ গ্রাম
(গ) ৫০ গ্রাম (ঘ) ১০০ গ্রাম

৭। সপ্তাহে কয়বার প্রজনন সারের সীমেন সংগ্রহ করা হয়।
(ক) ১ বার (খ) ২ বার
(গ) ৩ বার (ঘ) ৪ বার

৮। প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য প্রজনন ষাঁড়ের দৈনিক কী পরিমাণ সুষম দানাদার খাদ্য দিতে হয়?
(ক) ১.৫-২ কেজি (খ) ৩ কেজি
(গ) ৪ কেজি (ঘ) ৫ কেজি

৯। দৈনিক একটি গর্ভবতী গাভীকে কতটুকু কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হয়।
(ক) ৫-১০ কেজি (খ) ১২-১৫ কেজি
(গ) ১৫-২০ কেজি (ঘ) ২০-২৫ কেজি

পাঠ-১৮.৪ : অসুস্থ গবাদি পশুর লক্ষণ ও রোগের প্রকারভেদ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অসুস্থ পশুর লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পশুর রোগের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রধান রোগগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

আমাদের দেশে গৃহপালিত পশু পালনে একটি বড় সমস্যা এদের রোগব্যাধি। তাই লাভজনকভাবে গবাদি পশু পালন করতে হলে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ হতে হবে। সুস্থ পশুর লক্ষণগুলো জানা থাকলে পশু অসুস্থ হলে তা সহজেই বুঝা যাবে। পশুর কিছু বাহ্যিক লক্ষণ দেখে সুস্থ পশু চেনা যায়।

সুস্থ পশুর বাহ্যিক লক্ষণগুলো হল

১। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সজাগ থাকবে এবং গতিবিধি ও হাটাচলা স্বাভাবিক হবে।
২। পশুর নাক, মুখ, চোখ পরিষ্কার থাকবে। চোখ উজ্জ্বল ও নাকের অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু ঘাম থাকবে।
৩। শরীরে লোম মসৃণ ও চকচকে থাকবে। কান ও লেজ নেড়ে মশা, মাছি তাড়াবে।
৪। পশু চার পায়ের উপর শিথিলভাবে দাঁড়ায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির গতি স্বাভাবিক থাকবে।
৫। শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে।
৬। খাওয়ার রুচি স্বাভাবিক থাকবে এবং খাবার পর জাবর কাটবে।
৭। পশুর মল-মূত্র স্বাভাবিক থাকবে।

উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলো কোন ব্যতিক্রম দেখা গেলেই বুঝতে হবে পশুটি অসুস্থ।

গবাদি পশুর রোগের প্রকার

গবাদি পশুর রোগসমূহকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) সংক্রামক রোগ (খ) পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত রোগ (গ) অপুষ্টিজনিত রোগ (ঘ) বিষক্রিয়াজনিত রোগ।

১। সংক্রামক রোগ : সংক্রামক রোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

(ক) ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ

(খ) ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ

ভাইরাস জনিত সংক্রামক রোগের মধ্যে ক্ষুরা রোগ, জলাতঙ্ক ও গো-বসন্ত রোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগের মধ্যে তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ওলান প্রদাহ ও নিউমোনিয়া প্রধান। এ সব রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে নিম্নেআলোচনা করা হলো।

(ক) ভাইরাস জনিত রোগ

১। ক্ষুরা রোগ : এটি একটি অত্যন্ত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগ ছোঁয়াছে। আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে খাদ্য পানি ও বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষণ : মুখে ও ক্ষুরায় ঘা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। মুখ দিয়ে লালা পড়ে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। আক্রান্ত পশু কিছু খেতে পারে না, হাঁটতে পারে না এবং দুর্বল হয়ে যায়। গাভীর দুধ কমে যায়। এই রোগে আক্রান্ত বাছুরকে বাঁচানো খুবই কঠিন।

চিকিৎসা : পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা বরিক এসিড ও ফিটকিরি মিশ্রিত পানিতে মুখ এবং পা ধুয়ে দিতে হবে। টেরামাইসিন বা ভেসাডিন ইনজেকশন দিলে ভালো ফল পেতে দেখা যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

(ক) রোগাক্রান্ত পশুকে আলাদা করতে হবে।

(ক) জীবাণু নাশক ওষুধ দিয়ে ঘর ও সরঞ্জাম ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।

(গ) রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে আশেপাশের সকল সুস্থ পশুকে টীকা দিতে হবে।

২। জলাতংক

এটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সাধারণত কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী এ রোগের জীবাণু বহন করে। ভাইরাসে আক্রান্ত কুকুরের কামড়ে গবাদি পশুতে এ রোগ হয়। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত পশুর মুখের লালা সুস্থ প্রাণীর দেহের ক্ষতে লেগেও রোগ সংক্রামিত হয়। এ রোগ পশু থেকে মানুষেও সংক্রমিত হতে পারে।

লক্ষণ : সাধারণত রোগাক্রান্ত কুকুর কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর লক্ষণ দেখা যায়। তবে কখনও ৬ মাস পরও লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত পশু অস্বাভাবিক আচরণ করে। এমনকি আক্রমণ করতে তেড়ে আসে। মুখ দিয়ে লালা ঝরে। আস্তে আস্তে পক্ষাঘাত দেখা দিয়ে পশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে। খাবার খেতে পারে না। চোয়াল ঝুলে যায়। জিহ্বা বেরিয়ে আসে। পশু দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এক সময় মাটিতে শুয়ে পড়ে ও মারা যায়।

চিকিৎসা: কামড়ানো স্থান ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মত ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পূর্বে নাভীর চারপাশে দিনে ৩০ মিলি করে ১৪ দিনে ১৪টি টীকা ইনজেকশন হিসেবে দিতে হয়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা : লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া যায় না। পোষা কুকুরকে যথা সময়ে টীকা দিতে হবে। রাস্তার বেওয়ারিশ সকল কুকুর মেরে ফেলতে হবে।

৩। গো-বসন্ত

এটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। রোগাক্রান্ত পশুর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। মুখে ও খাদ্যনালীতে ঘা হয়। পায়খানা প্রথমে শক্ত ও পরে পাতলা হয়। পশুর শ্বাসকষ্ট হয়। আক্রান্ত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই পশু মারা যায়।

চিকিৎসা : এন্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড ইনজেকশনে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা : আক্রান্ত পশুকে আলাদা করতে হয়। সুস্থ পশুকে নিয়মিত টীকা দিতে হয়।

(খ) ব্যাকটোরিয়াজনিত রোগ

১। তড়কা : ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ায় এ রোগ হয়ে থাকে। রোগাক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে এই রোগ ছড়ায়।

লক্ষণ : দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। পাতলা রক্ত মিশ্রিত পায়খানা হয়। নাক, মুখ ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত রক্ত যুক্ত ফেনা বের হয়। পশু হঠাৎ মাটিতে ঢলে পড়ে খিঁচুনী দিয়ে মারা যায়।

চিকিৎসা:- অনেক সময়ই চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায় না। প্রাথমিক অবস্থায় এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিলে পশু সেরে উঠতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ : বর্ষাকালে স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা আবহাওয়ায় এ রোগ বেশি হয়। তাই বর্ষার পূর্বেই পশুকে প্রতিষেধক টীকা দিতে হয়।

২। বাদলা : এটি গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। অল্প বয়সের পশুতেই এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়সের গরু বাছুরেই এ রোগ হয়ে থাকে। রোগাক্রান্ত পশুর মলদ্বারাও জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ : খুব তাড়াতাড়ি রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আক্রান্ত পশু মারা যায়। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানের বিশেষ করে পেছনের অংশের মাংসপেশী ফুলে যায়। ফুলা জায়গায় চাপ দিলে হাতে গরম লাগে ও পচ্‌পচ্‌ শব্দ হয়। আস্তে আস্তে ফুলা স্থান কালচে হয়ে যায় ও পচন ধরে। রোগাক্রান্ত পশু দুর্বল হয়ে মারা যায়।

চিকিৎসা : রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এন্টিবায়ে টিক দ্বারা চিকিৎসা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা : রোগ দমনের জন্য সুস্থ পশুকে ৬ মাস বয়সের পূর্বেই টীকা দিতে হয়।

৩। গলাফুলা : এটি গরু মহিষ, ছাগল, ভেড়ার ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। সকল বয়সের পশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সারাবছর এই রোগ দেখা যায়। তবে বর্ষার পর

স্যাঁতসেঁতে জমিতে পশু চরালে এ রোগ বেশি হতে দেখা যায়। অসুস্থ পশুর লালা, সর্দি, মলমূত্র, দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে রোগ জীবাণু সুস্থ পশুতে সংক্রামিত হয়।

লক্ষণঃ আক্রান্ত পশুর মাথা, গলা, ও গলকম্বল ফুলে যায়। দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। পাতলা পায়খানা হয়। জাবর কাটা ও দুধ দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। পশুর শ্বাসকষ্ট হয় এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে। রোগাক্রান্ত হওয়ার ২৪-৩৬ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ পশু মারা যায়।

চিকিৎসা : প্রাথমিক অবস্থায় এন্টিবায়োটিক ও সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা : আক্রান্ত পশুকে আলাদা করা। সকল সুস্থ পশুকে টীকা দেওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থা মেনে চলা।

৪। ওলান প্রদাহ : ব্যাকটেরিয়াজনিত এ রোগ সাধারণত দুগ্ধবর্তী গাভী ও ছাগীতে বেশি হতে দেখা যায়।

লক্ষণ : ওলান ফুলে যায়। দেহের তাপ বেড়ে যায়। দুধে রক্তাক্ত হলুদ বর্ণের তলানি পড়ে। ওলানের ভিতরে পুঁজ হয়। বাঁট ক্রমশঃ শক্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

চিকিৎসা : সর্তকতার সাথে নিয়মিত দুধ বের করতে হবে যাতে ওলানের দুধ না থাকে এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ দ্বারা সময়মত চিকিৎসা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা : গাভীকে সব সময় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে। ওলান পরিষ্কার রাখতে হবে। দুধ দোহনের সময় স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে। হাত পরিষ্কার করে দুধ দোহন করতে হবে। মাছি না বসে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫। কাফসাওয়ার বা বাছুরের উদরাময় : এটি বাছুরের ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি মারাত্মক রোগ। সাধারণত জন্মের সাথে সাথে বাছুর এ রোগে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ : রোগাক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বাছুরে সাদা, পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ করে। প্রথম দিকে জ্বর হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে শরীরের তাপমাত্রা কমে স্বাভাবিকের নিচে নেমে আসে। বাছুর আস্তে আস্তে নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। খাওয়া, ছেড়ে দেয় এবং মারা যায়।

চিকিৎসা : লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শমত ব্যবস্থা নিতে হবে। এন্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড জাতীয় ওষধ খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ : জন্মের সাথে সাথে বাছুরকে মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হয়। শরীরের পানিশূন্যতা দূর করার জন্য স্যালাইন খাওয়ানো যেতে পারে। বাছুরকে শুকনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাস্থকর স্থানে রাখতে হবে।

৬। নিউমোনিয়া : এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সাধারণত ঠান্ডা পরিবেশে এ রোগ হয়।

লক্ষণ : আক্রান্ত পশুর নাক, মুখ দিয়ে সর্দি বের হয়ে। পশু ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয় এবং শ্বাসকষ্ট ও কাশি হয়। দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। খাওয়া কমে যায়।

চিকিৎসা : আক্রান্ত পশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হয়। খড় দিয়ে বিছান করে দিতে হয় যাতে ঠান্ডা না লাগে। ভেসাডিন, এন্টিবায়োটিক ও সালফোনেমাইড জাতীয় ওষুধ দিয়ে সময়মত চিকিৎসা করলে পশু ভালো হয়ে যায়।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা : স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান এবং পালন ব্যবস্থায় এ রোগের আশঙ্কা থাকে না। আক্রান্ত পশুকে আলাদা করে চিকিৎসা করতে হয়।

গ) পরজীবীঘটিত রোগ

দুই ধরনের পরজীবী গবাদীপশুর ক্ষতিসাধন করে। যথা–

১। অন্তঃপরজীবী, যেমন–

(ক) গোলাকৃমি;

(খ) পাতা কৃমি বা যকৃত কৃমি;

(গ) ফিতা কৃমি;

আমাদের আবহাওয়ায় পরজীবীর বিস্তার খুব দ্রুত হয়। বাংলাদেশের সব গবাদি পশুই কোন না কোন কৃমি রোগে ভোগে। নিয়মিত ওষুধ খাওয়ালে এ রোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়।

২। বহিঃপরজীবী, যেমন–

(ক) উকুন

(খ) আটালী

(গ) মশা ও মাছি।

এদের আক্রমণে পশু দুর্বল হয় এবং এতে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। পরজীবীর জন্য নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা মেনে চললে এদের উপদ্রব কম হয়।

পরজীবী প্রতিরোধ : ঘরবাড়ি, আশেপাশের জায়গা পরিষ্কার রাখা। জলাবদ্ধ জমিতে পশুকে না চরানো। নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার করা। গবাদি পশু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। পরিবেশ শুকনা ও আলো-বাতাস পূর্ণ রাখা।

৪। অপুষ্টিজনিত রোগ : সাধারণত সুষম খাদ্যের অভাবে এ রোগ হয়। গবাদি পশুকে নিয়মিত সুষম খাদ্য দিলে এ ধরনের রোগের আশঙ্কা থাকে না। খাদ্যে যাতে সকল উপাদান থাকে খাদ্য তৈরির সময় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়।

ঘ) বিষক্রিয়াজনিত রোগ : এ রোগের প্রকোপ খুব বেশি নয়। তবে কখনও কখনও কোন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ কীটনাশক বা বিষাক্ত ঘাস, লতাপাতা খেয়ে পশুর এ রোগ হতে পারে। এর প্রতিকারের জন্য তড়িৎ চিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যবস্থা নিতে হয়।

পশুর স্বাভাবিক তাপমাত্রা নাড়ির স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হার

পশুর নাম	দেহের তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেঃ গ্রেঃ)	নাড়ির স্পন্দন (প্রতি মিনিটে)	শ্বাসপ্রশ্বাসের হার (প্রতি মিনিটে)
বাছুর	৩৮.৫-৪০০	৯০-১০০	৩০-৪০
ষাঁড়	৩৮.৪-৩৯.৫০	৪০-৬০	১২-১৬
গাভী (গরু, মহিষ)	৩৭.৫-৩৯.৫০	৬০-৯০	১২-১৬
ছাগল (বাচ্চা)	৩৯-৪১০	৮০-১১০	১২-২০
ছাগল (বয়স্ক)	৩৮.৫-৪০.৫০	৭০-৯০	১২-২০
ভেড়া (বাচ্চা)	৩৮.৫-৪০.৫০	৮৫-৯৫	১৫-১৮
ভেড়া (বয়স্ক)	৩৮.৫-৪০০	৭০-৯০	১২-২০

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। গবাদি পশুর রোগসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ১ ভাগে (খ) ২ ভাগ
(গ) ৩ ভাগ (ঘ) ৪ ভাগ

২। ক্ষুরা রোগের জীবাণু কোন ধরনের?

(ক) ব্যাকটেরিয়া (খে) ভাইরাস
(গ) ছত্রাক (ঘ) পরজীবীজনিত

৩। বাদলা রোগ কোন বয়সের পশুতে হয়?

(ক) ৬ মাস থেকে ২ বছর (খ) ৩ বছর
(গ) ৪ বছর (ঘ) ৫ বছর

৪। কোন রোগে পশু হঠাৎ মারা যায়?

(ক) বাদলা (খ) তড়কা
(গ) ওলান ফুলা (ঘ) নিউমোনিয়া

৫। অপুষ্টিজনিত রোগের প্রতিকার কীভাবে করতে হয়?

(ক) সুষম খাদ্য দিয়ে (খ) এন্টিবায়োটিক ওষুধ দিয়ে
(গ) ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে (ঘ) নিয়মিত টীকা দিয়ে

পাঠ-১৮.৫ : রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোগ দেখা দিলে করণীয় এবং রোগের প্রতিষেধক ও মৃত পশুর সৎকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

আমাদের দেশে গবাদি পশু অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সময়মত ব্যবস্থা না নিলে এসব রোগে কৃষকের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। গবাদি পশুর রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ-ব্যাধি যাতে না হয় সেদিকে যত্নবান হওয়া শ্রেয়। কেননা অনেক সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায় না। তাছাড়া চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল। অনেক সময় রোগের বিস্তার এত দ্রুত এবং হঠাৎ হয় যে চিকিৎসার সময়ও পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে সহজেই গবাদি পশুকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নে বর্ণিত ৪টি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হয়।

ক. গবাদি পশুর স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যবস্থা

১। গবাদি পশুর ঘর স্বাস্থ্যসম্মত হতে হয়।

২। ঘর সব সময় শুকনা এবং পর্যাপ্ত আলো–বাতাসযুক্ত হতে হয়।

৩। ঘর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

৪। গবাদি পশুকে নিয়মমত সুষম খাদ্য ও পর্যাপ্ত পানি দিতে হয়।

৫। বিভিন্ন বয়সের পশুকে আলাদা আলাদাভাবে খাদ্য ও পানি দিতে হয়।

৬। বাইরের লোককে খামারে প্রবেশ করতে না দেয়া।

৭। গবাদি পশুকে মশা-মাছির উপদ্রব হতে রক্ষা করতে হয়।

৮। বন্য প্রাণী যাতে খামারে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে নজর রাখা এবং জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলা।

৯। নতুন ক্রয় করা বা অন্য স্থান থেকে আনা গবদি পশুকে কয়েকদিন আলাদা রেখে রোগমুক্ত কিনা নিশ্চিত হওয়ার পর খামারের গরুর সাথে মেশানো।

১০। খামারের কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন, অনুসরণ ও মূল্যায়ন করা।

(খ) রোগ দেখা দিলে করণীয়

১। অসুস্থ পশুকে সংগে সংগে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া।

২। অসুস্থ গবাদি পশু একস্থান থেকে অন্যস্থানে না নেয়া এবং হাটে-বাজারে বিক্রয় না করা।

৩। অসুস্থ গবাদি পশু জবাই করে মাংস না খাওয়া।

৪। রোগাক্রান্ত গবাদি পশুর ব্যবহৃত খাদ্য, পানি অন্য পশুকে না দেয়া। খাদ্য, পানির পাত্র এবং সরঞ্জামাদি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেয়া।

৫। রোগাক্রান্ত পশুর মল-মূত্র, লালা ও পরিত্যক্ত খাদ্য মাটিতে পুঁতে ফেলা জীবাণু নাশক ওষুধ। যেমন– ডেটল, স্যাভলন, ফিনাইল, আইওসান ইত্যাদি দ্বারা ভালো করে বাসস্থান ও সরঞ্জামাদি পরিষ্কার করা।

৬। যথাশীঘ্রই সম্ভব পশু চিকিৎসক বা চিকিৎসা কর্মীর পরামর্শ নেয়া।

গ. রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা

১। সুস্থ গাবদি পশুকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টীকা দেয়া।

২। নিয়মিত কৃমির ওষুধ খাওয়ানো।

৩। রোগ বিস্তার রোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

ঘ. মৃত গবাদিপশুর সৎকার

আমাদের দেশে সাধারণত মৃত গাবদি পশু যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হয়। ফলে কাক, চিল, কুকুর, বন্যপ্যাণী ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কিছু কিছু সংক্রামক রোগ বাতাসের

সাহায্যেও ছড়ায়। তাই- মৃত পশু সংক্রামক রোগে মারা গেলে মাটির ০.৫ মিটার নিচে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। মাটিতে পুঁতে ফেলার পর এর উপরিভাগে চুন বা ডি.ডি.টি ছিটিয়ে শোধন করতে হবে।

১। মৃত পশুকে মাটির নিচে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২। মৃত পশুর উচ্ছিষ্ট খাদ্য ও পানি পুঁতে ফেলতে হবে।

৩। মৃত পশুর ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলতে হবে অথবা জীবাণু নাশক ওষুধ দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

সারমর্ম

গবাদি পশুর রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া শ্রেয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যবস্থা, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, মৃত পশুর সৎকার ও রোগ দেখা দিলে করণীয় বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধের জন্য কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হয়?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২। গবাদি পশুর বাসস্থান কেমন হওয়া উচিত?
(ক) আলো বাতাস যুক্ত (খ) অন্ধকার
(গ) স্যাঁতসেঁতে (ঘ) আলো বাতাসহীন

৩। গবাদি পশুর রোগ দেখা দিলে কী করতে হয়?
(ক) বাজারে বিক্রয় করে দিতে হয় (খ) জবাই করে ফেলতে হয়
(গ) অসুস্থ পশুকে সংগে সংগে আলাদা করতে হয় (ঘ) টীকা দিতে হয়

পাঠ-১৮.৬ : টীকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- টীকা সংরক্ষণের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।
- টীকা পরিবহন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- টীকা প্রদানে করণীয় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংক্রামক রোগ হতে গবাদিপশুকে বাঁচানোর জন্য সুস্থ অবস্থায় নিয়মিত টীকা প্রদান করা হয়। আমাদের দেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির নিম্নে বর্ণিত টীকা উৎপাদন করা হয়।

গবাদি-পশুর টীকা :

১। গো-বসন্ত রোগের টীকা;

২। ক্ষুরা রোগের টীকা;

৩। জলাতঙ্ক রোগের টীকা;

৪। তড়কা রোগের টীকা;

৫। বাদলা রোগের টীকা;

৬। গলা ফুলা রোগের টীকা।

টীকা সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও পরিবহন না করলে টীকার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। টীকা সংরক্ষণের নিয়ম ও মেয়াদ টীকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে জেনে নিতে হয়। কোন কোন টীকা শুধু শুষ্ক স্থানে রাখলে চলে। আবার কোন কোন টীকা হিমায়িত অবস্থায় রাখতে হয়।

গবাদি পশুর বিভিন্ন টীকা বীজ সংরক্ষণের নিয়ামাবলি

টীকার নাম	সংরক্ষণ পদ্ধতি	সংরক্ষণের মেয়াদ
১। ক্ষুরা রোগ	৪-৮০ সেঃ	৩-৬ মাস
২। গো-বসন্ত	-২০০ সেঃ, ৪-৮০ সেঃ	১ বছর, ১ মাস
৩। জলাতঙ্ক	-২০ সেঃ, ০০ সেঃ	১ বছর, ৪৮ ঘণ্টা
৪। তড়কা	৪-৮০ সেঃ	৬ মাস
৫। বাদলা	৪-৮০ সেঃ	৬ মাস
৬। গলা ফুলা	৪-৮০ সেঃ	৬ মাস

টীকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়ামাবলি

১। প্রতিষেধক টীকা সব সময়ই সুস্থ্য পশু-পাখিতে প্রয়োগ করতে হয়।

২। সংক্রামক রোগ বা কৃমিতে আক্রান্ত পশু-পাখিকে টীকা প্রয়োগ করা উচিত নয়। তাতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না।

৩। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবতী পশুকে টীকা দেওয়া উচিত নয়।

৪। টীকা বীজ কোন অবস্থাতেই সূর্যালোকের সংস্পর্শে আনা ঠিক নয়। ছায়ায় বা ঘরের মধ্যে ঠান্ডা জায়গায় টীকা গুলাতে ও প্রয়োগ করতে হয়।

৫। ব্যবহারের সময় মিশ্রণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাত্র, সিরিজ-নিডল, ডাইলিউশনের জন্য ব্যবহৃত তরল পদার্থ, টীকা ব্যবহারকারীর হাত ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

৬। জীবাণুমুক্তকরণের জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়।

৭। প্রতিষেধক টীকা সকালে বা সন্ধ্যার সময় প্রয়োগ করা উত্তম।

৮। বোতলের টীকা ব্যবহার আরম্ভ করলে ১ ঘণ্টার মধ্যে তা ব্যবহার করে ফেলতে হবে।

টীকা পরিবহনের নিয়ম

গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য সঠিকভাবে টীকা পরিবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টীকা হিম শীতল ভ্যানে করে অথবা ফ্লাস্কে বা ছোট ছোট বাক্সে বরফ ভর্তি করে পরিবহন করতে হয়। টীকা সংরক্ষণ, পরিবহন এবং ব্যবহারের সময় যাতে সরাসরি সূর্য কিরণ না লাগে সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হয়। অন্যথায় টীকার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

টীকার কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণ

১। সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে।

২। মেয়াদ উত্তীর্ণ টীকা ব্যবহার করলে।

৩। সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও পরিবহন না করলে।

৪। যথাস্থানে ও যথা নিয়মে টীকা না দিলে।

৫। একই সময়ে ২টি ভিন্ন ভিন্ন রোগের টীকা দিলে।

৬। সঠিক রোগের টীকা না দিলে।

সারমর্ম

- ❒ সংক্রামক রোগের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সুস্থ পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করতে হয়।
- ❒ টীকা সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও পরিবহন না করলে টীকার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।
- ❒ টীকা হিম শীতল ভ্যানে বা ফ্লাস্কে বরফ দিয়ে পরিবহন করতে হয়।
- ❒ টীকা ব্যবহারের নিয়মাবলি যথাযথভাবে পালন না করলে ভালো ফল পাওয়া যায় না।
- ❒ টীকা সংরক্ষণ, পরিবহন ও ব্যবহারের সময় যাতে সূর্য কিরণ বা তাপ না লাগে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষুরা রোগের টীকা কত তাপমাত্রায় এবং কতদিন সংরক্ষণ করা যায়

(ক) ৪-৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৩-৬ মাস (খ) ৪-৮ সেঃ তাপমাত্রায় ২ বছর

(গ) ১০° সেঃ তাপমাত্রায় ২ মাস (ঘ) ১৫° সেঃ তাপমাত্রায় ১ মাস

২। ৪-৮° সেঃ তাপমাত্রায় তড়কা রোগের টীকা কতদিন রাখা যায়?

(ক) ১ বছর (খ) ৬ মাস

(গ) ৩ মাস (ঘ) ২ মাস

৩। কিভাবে টীকা পরিবহন করতে হয় ?

(ক) হিম শীতল ভ্যানে (খ) গরম পাত্রে

(গ) পকেটে করে (ঘ) ব্যাগে করে

৪। গোলানো টীকা কত সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হয়?

(ক) ১ ঘণ্টা (খ) ২ ঘণ্টা

(গ) ৩ ঘণ্টা (ঘ) ৪ ঘণ্টা

ব্যবহারিক

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাছুরকে বাদলা রোগের টীকা দিতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ৪-৫ মাস বয়সের একটি বাছুর;

২। ১ বোতল বাদলা টীকা ;

৩। সিরিঞ্জ ও সুঁচ;

৪। গরম পানি;

৫। তুলা ও স্পিরিট;

৬। খাতা ও কলম।

কাজের ধাপ

১। সিরিঞ্জ ও সুঁচ গরম পানিতে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিন।

২। বোতলের মুখের অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনা ভেঙ্গে নিন।

৩। সিরিঞ্জ ও সুঁচের সাহায্যে রাবার কর্ক ছিদ্র করে বোতল হতে ৫ মিলি. টীকা সিরিঞ্জে উঠিয়ে নিন।

৪। বাছুরটিকে আদর করে একজনে শক্ত করে ধরুন।

৫। গলার ঢিলা চামড়া এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে চামড়ার নিচে সুঁচ ফুটা করে দিন।

৬। সিরিঞ্জের টীকা সূচের মধ্য দিয়ে ইনজেকশন দিন।

৭। সুচ বের করে জায়গাটি মালিশ করে নিন। স্পিরিট মিশ্রিত তুলা দিয়ে জায়গাটি ঘঁষে দিতে পারেন।

৮। একই নিয়মে অন্যান্য পশুকে টীকা দিয়ে ১০০ মিলি টীকা ব্যবহার করে ফেলুন।

৯। খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

সাবধানতা

১। টীকা সিরিঞ্জে উঠানোর পূর্বে প্রতিবারই বোতল ঝুকিয়ে নিতে হবে।

২। বোতলের টীকা ব্যবহার করা আরম্ভ করলে ১ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে। কিছু ব্যবহার করে কিছু পরে ব্যবহারের জন্য রাখা যাবে না।

৩। গরু যেন লাফালাফি না করে সে ব্যাপারে সাবধান হবেন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। দেশী গবাদি পশুর পরিচিতি বর্ণনা করুন।

২। গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

৩। জাত উন্নয়নের পদ্ধতি কয়টি? সংক্ষেপে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

৪। গাভীর ঋতুকালের লক্ষণগুলো লিখুন।

৫। গর্ভবতী গাভীর লক্ষণগুলো আলোচনা করুন।

৬। গর্ভবতী গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৭। বাছুরের দানাদার খাদ্য তালিকা লিখুন।

৮। গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৯। টীকা সংরক্ষণের নিয়মাবলি লিখুন।

১০। টীকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়মগুলো আলোচনা করুন।

১১। অসুস্থ গবাদি পশুর লক্ষণ ও রোগের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১২। গবাদি পশুর ক্ষুরা রোগের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন।

১৩। গবাদি পশুর বাদলা ও তড়কা রোগ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.১ : ১। ক ২। ক ৩। ক ৪। গ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.২ : ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ
৭। খ ৮। ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৩ : ১। গ ২। গ ৩। গ ৪। খ ৫। খ ৬। গ
৭। খ ৮। ক ৯। খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৪ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৫ : ১। গ ২। ক ৩। গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৬ : ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ক।